বিশ্ববীক্ষা

তৃতীয় বর্ষ । প্রথম সংখ্যা
১৪০০

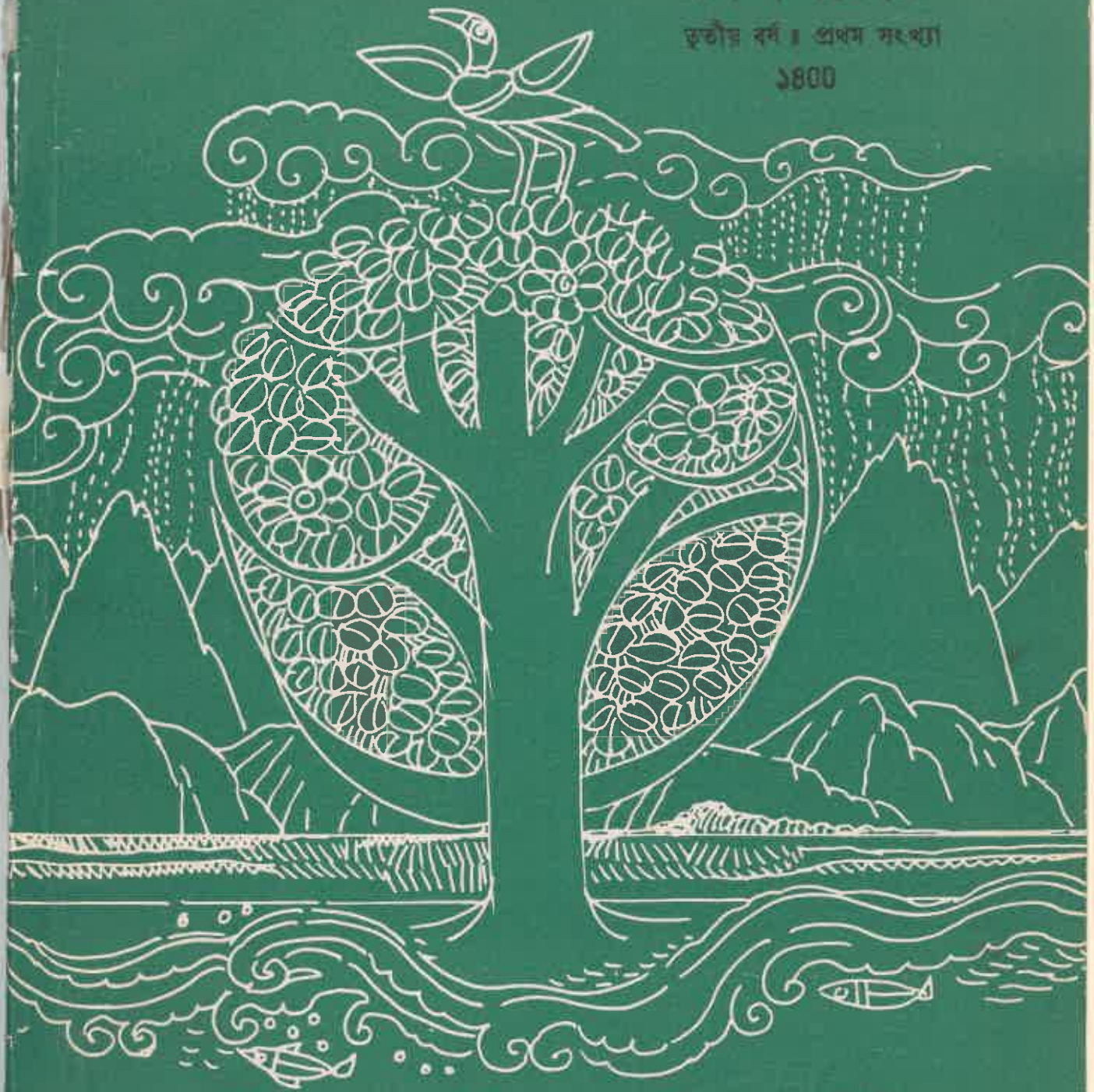

অখিল ভারত ভূবিদ্যা ও পরিবেশ সমিতি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

গবেষণামূলক প্রবন্ধ :

প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় জনগণের ভূমিকা : পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতা — শ্রী বিপ্লব ভূষণ বসু···১

মাতা পৃথিবী — শ্রী শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত ···১৮

আধুনিক ভূগোলের প্রভাত : একটি অনুবাদ প্রয়াস — ডঃ (শ্রীমতী) কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত···২৪

প্রাকৃতিক বিপর্যয় : ভূমিকম্প ও তার রূপ — ডঃ সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়···৩৯

শিলিগুড়ির পরিবেশ ও পরিবহণ প্রসঙ্গে — শ্রীমতী অণিমা ভট্টাচার্য···৫২

উৎপাদনের উপাদান এবং কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় : একটি গ্রামভিত্তিক আলোচনা — শ্রীমতী শর্বরী সান্যাল···৫৬

বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্তমান গবেষণার ধারা সম্পর্কিত সংবাদ ও তথ্য :

সেন্টার ফর্ স্টাডি অফ্ ম্যান এ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্ট ···৬৭

গ্রন্থ পরিচয় : ···৭৩

বার্ষিক বিবরণী ···৭৭

লেখিকা ও লেখকদের প্রতি ···৮১

বিশ্ববীক্ষা
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আধুনিক ভূগোলের প্রভাত : একটি অনুবাদ প্রয়াস

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

গ্রন্থ পরিচয় : আঠারোশো সাতানব্বই সালে লণ্ডনের জন মারে কোম্পানির ছাপানো 'দি ডন অফ মডার্ণ জিওগ্রাফি : এ হিস্ট্রি অফ এক্সপ্লোরেশন অ্যাণ্ড জিওগ্রাফিক্যাল সায়েন্স' বইটির লেখক সি. রেমণ্ড বীজলে, এম. এ., ফেলো অফ রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি।

বইখানি বর্ধমান রাজপরিবারের গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্গত ছিল। রাজসংগ্রহাবলীর অন্যান্য বই-এর সঙ্গে এই বইটিও স্থান পায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। বইটির কল নং 910.8, B 386 D, অ্যাকসেশন নং 1656, তারিখ 17.4.63। কলেবরে বইটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়; সাতটি অধ্যায়, অতিরিক্ত নোট ও ইনডেক্সসহ মোট ৫৩৮ পাতায় সম্পূর্ণ।

সূচনা : 'আধুনিক ভূগোলের প্রভাত' বইটির মুখবন্ধে বীজলে বলেছেন : 'This volume aims at presenting an account of geographical movements in Christendom, and especially in Latin or Western Christendom, during the early Middle Ages (from about A. D. 300 to about A. D. 900); to which has been added a summary account of non-Christian movements, especially in the Arab and Chinese dominions and races, during the same period. Every geographical enterprise or speculation of importance in these centuries should thus come within the scope of this attempt'.

দু'টি বিষয়কে আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়েছেন বীজলে। প্রথমত, তাঁর কাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও অসম্পূর্ণতা থেকেই যেতে পারে, হয়তো দু'একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাদ প'ড়েও যেতে পারে। আরব ও চীনা পর্যটকদের বিবরণগুলি যে তাঁর লেখায় খ্রীষ্টীয় পাশ্চাত্যের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের লেজুড় হিসেবে ছাড়া তেমন গুরুত্ব পায়নি, এ-ও তিনি স্বীকার করেছেন। অথচ অন্যত্র এগুলি সম্পর্কেই বলেছেন, 'Moslem anq chinese geography of this time, which forms (down to about A. D. 950) so surprising a contrast to the contemporary ruins of classical enterprise and culture in the West'.

দ্বিতীয়ত, 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটির সঠিক অর্থ যে নির্ভর করে তার ব্যাখ্যার ওপরে এ বিষয়েও বীজলে সচেতন। তাঁর মতে সে সময়ের ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও চিন্তাজগতে যে অবক্ষয় ঘটেছিল, তারই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

প্রকাশনা দপ্তরে রচনাটি জমা পড়ে
৮ই পৌষ, ১৩৯৯

বীজলে বর্ণিত সময়কালে ভূগোল ঘুমিয়ে আছে, আবার ধীরে ধীরে জাগছেও। আলো-আঁধারিতে মেশানো ইতিহাসের এই যে যুগসন্ধিক্ষণ, একে ভাল ক'রে জানা প্রতিটি ভৌগোলিকের কর্তব্য। তিনি দেখিয়েছেন মধ্যযুগে ভূগোলের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দু'ক্ষেত্রেই ধর্মীয় চিন্তাধারার গুরুত্ব; ধর্মযাজকদের ভ্রমণের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের আশ্চর্য প্রসার; ভূপর্যটনে ধর্মীয় যাত্রার ভূমিকা; সুপ্রাচীন জাগতিক মিথ (myth) বা অতিকথনগুলির প্রসার অথচ তুলনামূলক ভাবে প্রকৃত ধ্রুপদী বিজ্ঞানের অবলুপ্তি; এবং কসমাস ও অন্য কয়েকজনের বাইবেলবাণীর অনুসরণে এক দিব্যভূমণ্ডল গঠনের চেষ্টা। এরই অপরপিঠে বীজলে বর্ণনা করেছেন আরব মননশীলতার দ্রুত, অতিদ্রুত বিকাশ, বৌদ্ধ প্রচারযন্ত্রের কার্যকলাপ' এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এশিয়ার প্রতিটি অংশের নিবিড় যোগাযোগ। বীজলের মতে, 'All these features, in their different ways, are full of suggestions, when viewed by the light of the past and future position of Europe'. কোনও ইউরোপীয় কলমে এরকম নিরপেক্ষ বিচার যে লেখা হ'তে পারে, তাও আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, এ সত্যিই আশ্চর্য।

বীজলের লেখার পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে সে যুগের ল্যাটিন ও গ্রীক বিজ্ঞানের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের জয়যাত্রার ফলে প্রাচ্যের প্রতিক্রিয়া, যা মানুষের ইতিহাসের পথকে তো বটেই, ভূগোলকেও প্রভাবিত করেছে। এই বইতে বর্ণিত ঘটনাবলীর শেষ পর্যায়ে, মধ্যযুগের শেষ ভাগে ও রেনেসাঁ-কালের সামুদ্রিক অভিযানলব্ধ আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে ইউরোপ ধীরে ধীরে তার হারানো প্রতিষ্ঠা আরেকবার ফিরে পেল এবং বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের মাধ্যমে আধুনিক জীবনে প্রবেশ করল। তবে সেই উজ্জ্বল যুগ এই বই-এর আলোচ্য বিষয় নয়; বরং দুই যুগের মধ্যে রয়েছে, 'a gulf whose depth and width grow steadily upon any student of mediaeval life and thought'.

বীজলে বর্ণিত অন্ধকার যুগের ভূগোলে তৈরী মানচিত্রগুলিও তাঁর মতে অবহেলার যোগ্য নয়। প্রতিটি ভৌগোলিক একথা মানেন যে আজ ভূগোলের বিষয়বস্তুর যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তার গঠনমূলক পর্যায়ে এক বড় অবদান আছে মধ্যযুগের। এই যুগের ভূগোল চর্চায় বীজলের বইটি এক অমূল্য উপকরণ।

এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাদের কথা ভেবে বইটির প্রথম অধ্যায় অনুবাদের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরনো যুগের ইংরেজি ভাষা অনেক সময় আড়ষ্টতার কারণ ঘটালেও যথাসম্ভব চেষ্টা রেখেছি মূলানুগ থাকার।

বই-এর প্রথম অধ্যায়—প্রাথমিক পরিচয় : বিভিন্ন ভৌগোলিক অভিযান ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মধ্যযুগ ও তৎপরবর্তী কালে, বিশেষতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক জ্ঞানের নতুন দিগন্ত সূচিত হ'ল। আমেরিকা আবিষ্কার, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌঁছোবার পথ অনুসন্ধান এবং

সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফলে* একদিকে যেমন আধুনিক জগতের আয়তনগত প্রসার হ'ল, অন্যদিকে তেমনি ভৌগোলিক জ্ঞানেরও ব্যাপ্তি ঘটল। প্রতিটি সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে আছে যুগ-যুগান্তের অসংখ্য ব্যর্থতা। কলম্বাসের কালের এই আবিষ্কারগুলির বীজও তেমনি বহুদিন ধ'রে লালিত-পালিত ও পরিণত হচ্ছিল। এই অর্থে মধ্যযুগকে 'প্রস্তুতির যুগ' আখ্যা দেওয়া যায়। ধ্রুপদী ভূগোলের এই দিকটির প্রতি অনেকেই যথেষ্ট মনোযোগ ও গুরুত্ব দেন নি।

মধ্যযুগ ও আধুনিককালে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার একান্তভাবে ইউরোপের বিস্তৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সঙ্গে যুক্ত। এই উন্নতির ইতিহাসকে স্বভাবতই দু'ভাগে ভাগ করা চলে : হতাশা, ব্যর্থতা ও পুনঃ প্রচেষ্টার যুগ এবং সাফল্যের কাল। ১৪৮৬ সালে বার্থোলোমিউ দিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ থেকে ১৫২০-২২ সালে ম্যাগেলানের জলপথে বৃত্তাকারে পৃথিবী প্রদক্ষিণ—এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে এই দুই কালের অস্পষ্ট সীমারেখা। ১৪৮৬ সাল পর্যন্ত যে মধ্যযুগ, তাকে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায় : অন্ধকারের যুগ এবং ধর্মযুদ্ধের যুগ। বর্তমান লেখায় এই প্রথম ভাগটির আলোচনাই মুখ্য। খ্রীষ্টীয় ৩০০ থেকে ৯০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অন্ধকারের যুগেরও কতকগুলি ভাগ করা যায়, তবে অত সূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে এই সময়কালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হ'ল মানুষের জীবন ও বিজ্ঞানে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের প্রাধান্য।

এযুগে কেবলমাত্র জ্ঞানানুসন্ধিৎসা অথবা রাজনৈতিক এমনকি ব্যবসায়িক লাভের অনুরোধে ভূগোলচর্চার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের অভিযান ও ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম এবং এগুলির বিবরণও লেখা হ'ত ধর্মীয় স্বার্থে। এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সঠিক জ্ঞানের কোনওরকম বিস্তার ঘটছিল না। হয়তো এজন্যেই মধ্যযুগের এই ভাগে বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। অথচ দ্বিতীয়ার্ধে অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পাওয়া যায় ; প্রথমত, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের ভাইকিংদের সমুদ্রযাত্রা ও বিজয় ; দ্বিতীয়ত, ১০৯৬ থেকে ১২৭০ সাল পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধ, যে সময়ে জলপথে মার্কোপোলো এবং স্থলপথে অন্যান্য কয়েকটি অভিযান সফল হয়েছে ; তৃতীয়ত, প্রায় ১৩০০ থেকে ১৪৮৬ সাল পর্যন্ত পরিবর্তনের সময়, যে যুগে সমুদ্রাভিযান সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় এবং পর্তুগালের রাজা প্রিন্স হেনরি (Prince Henry the Navigator) তখন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এসব বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের জনজীবনে কিছু কিছু প্রসার ও দ্রুতীকরণ ঘটছিল। শুধুমাত্র তীর্থযাত্রা, ভ্রমণ, বাণিজ্যপ্রচেষ্টা বা রাজনৈতিক জয়ই নয়, পরবর্তীকালের প্রতিটি উন্নতিরই পেছনে আছে অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি এক জলন্ত, অদম্য, কৌতূহলী ভালবাসা। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে ধর্মীয় ও ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সুদীর্ঘ অভিযান সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু ধর্মভাবের প্রাধান্যের ফলে এগুলির বিবরণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে লেখা

* ১৪৯২, ১৪৮৬-৯৮ ও ১৫২০ সালে

হয় নি। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের ফলে এক অঞ্চলের নতুন জ্ঞান দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারছিল না। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানরা আরব পর্যটকদের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত কতটুকুই বা জানতেন, কিংবা জানতে পারলেও কি মূল্য দিতেন? তারই ফলে, যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তনের আন্তরিক প্রয়াস জাগেনি, ততদিন খ্রীষ্টীয় ভূগোলে মুসলিম বিজ্ঞানধারার কোনও ছাপই পড়েনি।

ভাইকিংদের প্রচরণ ও বিস্তৃতি ইউরোপীয় জগতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল। ভাইকিংরাই প্রথম গ্রীণল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল, উত্তর সাগর ও তৎসন্নিহিত উত্তরপূর্ব ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছিল কিংবা রাশিয়ায় এক প্রকৃত সুসম্বদ্ধ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল। কিন্তু এগুলি প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলেও ভাইকিংদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল তারা প্রতিটি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী অঞ্চলে তাদের জাতি, সমাজ, সভ্যতা ও উপনিবেশকে প্রসারিত করেছিল এবং নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সেই অঞ্চলের মানুষদের দান করেছিল। ইউরোপীয় রক্তের যে উন্মাদনা রোমান সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিলীন হয়েছিল, সেই চারিত্রিক দৃঢ়তার আগুনকে সারা মধ্যযুগে কেবলমাত্র এই ভাইকিংরাই জ্বালিয়ে রেখেছিল। পরবর্তী কালের সাফল্যের পশ্চাতে এর ভূমিকা কম নয়।

ধ'রে নেওয়া যায় যে এই ছিল ভাইকিংদের সাধনা। এই নর্স (Norse) জাতির জীবনপ্রাচুর্য ও উৎসাহকে অনুকরণ ক'রে তাদের চিহ্নিত পথে এগিয়ে যাওয়া এবং লক্ষ্যসাধনই ছিল মধ্যযুগে ইউরোপের একমাত্র করণীয়। ধর্মযুদ্ধের যুগে ইউরোপের রাজনৈতিক, ফলত ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিস্তারের সম্মুখে ইসলাম যেন এক সুবিশাল বাধার প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রাচীরের পূর্বদিকে যেটুকু অংশে ইউরোপ নাকগলাতে পেরেছিল, তাতেই তার চোখে প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের সমৃদ্ধি ধরা পড়েছিল। ইউরোপ কখনও এই বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল না, প্রাচীন রোম চিরকাল এই ধনসম্পদ যাচ্ঞা ক'রে এসেছে, কোনও দিন পেতে পারে নি ; একথা তারা সহজেই ভুলে যায় নি।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী, অর্থাৎ পর্তুগীজদের উদ্যোগে আবিষ্কারের যুগের সূচনা পর্যন্ত, ইউরোপীয়রা প্রাচীন স্থলপথগুলি ধ'রে ধ'রে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়েছে। উপর্যুপরি ধর্মযুদ্ধ রাজনৈতিকভাবে ইউরোপকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে দিয়েছিল। তবুও ইউরোপে এক নতুন বাণিজ্যিক, সামরিক ও উপনিবেশ স্থাপনের উচ্চাশা এবং এক নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলিত ছিল। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, ইউরোপীয় জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের বিস্তারের জন্য প্রাচ্যবিজয় একান্তই অপরিহার্য ছিল। এখানেই নিম্নে উল্লিখিত ঘটনাটির গুরুত্ব।

আফ্রিকার তটরেখা বরাবর প্রাচ্যে পৌঁছোবার এক নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করতে পারলে শুধু যে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে তা নয়, সেই সঙ্গে পুরাতন শত্রুদের দুর্বল স্থানে আঘাত করা যাবে এবং পাশ্চাত্য বসতি বা উপনিবেশ তৈরীর উদ্দেশ্যে বিপুল নতুন ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া যাবে।

মধ্যযুগের শেষভাগে এই উদ্দেশ্যটুকু সমাধা করতে তৎপূর্বের বহুকালের প্রচেষ্টা দায়ী। বেশ কয়েকটি সামুদ্রিক অভিযানে জয়ী হবার পরেই পর্তুগীজ নাবিকরা এশিয়ার গুপ্তধন সংগ্রহে ব্রতী হয়। 'পৃথিবী গোলাকার' এই প্রাচীন ধারণা খ্রীষ্ট পরবর্তী প্রথম শতাব্দী থেকেই শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা অভ্রান্ত ব'লে মেনে এসেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল আফ্রিকার তটরেখা পরিক্রমায় সফলতা; এই দু'য়েরই ফলস্বরূপ কলম্বাসের সার্থক অভিযান। কোনও এক অজানা মহাদেশের সন্ধান এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। বরঞ্চ প্রিন্স হেনরি এবং তাঁর উত্তর পুরুষদের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সর্বাপেক্ষা সহজতম ও দ্রুততম পথে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছোনোই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

১৪৮৬ সালে বার্থোলোমিউ দিয়াজ ঝঞ্ঝা-অন্তরীপে পৌঁছান; ১৪৯২ সালে কলম্বাস ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করেন। অবশ্য তাঁর আর ভারতে পৌঁছোন হয়নি, পথিমধ্যেই তিনি আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন। এই নতুন মহাদেশের বিপুল সম্ভাবনা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল এবং ফলস্বরূপ কলম্বাসের ভারত অন্বেষণ সেখানেই কার্যত শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। ১৫২০-২২ সালে ম্যাগেলান দূর প্রাচ্যে পৌঁছোলেন। 'পৃথিবী গোল' এই সত্য কলম্বাস অনুমান করেছিলেন, ম্যাগেলান তাকে প্রমাণ করলেন। ইতিমধ্যে ভাস্কো-ডা-গামার লিসবন থেকে মালাবার সমুদ্রযাত্রা (১৪৯৭-৯৯) পর্তুগীজ ও আফ্রিকার নাবিকদের আশা ও ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সফল করল। বিভিন্ন দিকে এই সব নতুন ইউরোপীয় প্রচেষ্টা ও সাফল্যের ফলে খ্রীষ্টীয় রাষ্ট্রগুলি শেষ অবধি জগতে স্বীকৃতি পেতে শুরু করল। এক সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করার মতো তারাও গুপ্ত, বঙ্কিম ও দূরদর্শী আক্রমণ কৌশলগুলির দ্বারা হঠাৎ যেন প্রাচ্যের সব প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিলে। এই দুরূহ কাজ সমাধানের পথে তাদের অন্য যে সব লাভ হ'ল, সেগুলিও কম নয়; যেমন নতুন এক মহাদেশ অথবা পুরনো এক মহাদেশের অকল্পনীয় সমৃদ্ধ প্রত্যন্ত আবিষ্কার।

সংক্ষেপে এই ছিল মধ্যযুগে ইউরোপে এবং খ্রীষ্টীয় সমাজে ভৌগোলিক ভাবনা-চিন্তা ও আন্দোলনের লক্ষ্য ও ফলাফল। এরই পাশাপাশি দেখা যায় একই সময়কালে অখ্রীষ্টীয়, বিশেষতঃ আরব বা মুসলিম সভ্যতা উদ্ভূত চিন্তাধারার প্রবাহ। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে দেখা গেছে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার নতুন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা; অপরপক্ষে কতগুলি আলোড়ন থেকে প্রাচ্যের বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের কার্যাবলী কখনই পুরোপুরি মুক্ত হ'তে পারে নি। মুসলিম পর্যটকদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির প্রায় সবকটিই মার্কোপোলোর পূর্ববর্তীকালে লেখা। পরবর্তীকালের দু'একজন যেমন ইবনবতুতা বা আবুলফেদাও উচ্চস্তরের মুসলিম ভূগোলের জীবন পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বেশী দীর্ঘায়িত করতে পারেন নি। মুসলমান বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানীদের উত্তরাধিকারের ধারা তাঁদের সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় নি, অথচ সব মিলে যেন তাঁদের জ্ঞানচর্চায় একধরণের স্থবিরত্ব এসে গেছে এবং যেহেতু

মানুষের সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান একস্থানে স্থিরভাবে থাকতে পারে না, এগোতে না পারলে তাকে পেছোতে হবেই, সেইহেতু মুসলমান বিজ্ঞানীরা তাঁদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধ'রে রইলেন, এবং ধীরে ধীরে খ্রীষ্টীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁদেরই সঞ্চিত জ্ঞান পাথেয় ক'রে তাঁদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন। এভাবেই উচ্চতর মুসলিম জীবনধারা ও সভ্যতার ধ্বংস সম্পূর্ণ হ'ল।

সাধারণতঃ দেশ ও জাতিগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। চীনদেশের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। বহিঃপৃথিবীতে এই যুগে যে আন্দোলন চলেছে, নতুন দেশ আবিষ্কারের আগ্রহ গ'ড়ে উঠেছে চীনদেশে তা সম্পূর্ণ একধরনের নিস্পৃহতা, নিরপেক্ষতার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এই বই-এ যে সময়কালের কথা বলা হয়েছে সেই কালে 'দূরান্তের বর্বর'দের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত মুক্ত মেলামেশার উদ্দেশ্যে চীনদেশ খানিকটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ৮৭৮ সালের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পরবর্তীকালে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গল বিজয়ের আগে পর্যন্ত, রাষ্ট্র হিসেবে এধরণের বিপজ্জনক ঝুঁকির আর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি।

চেঙ্গিস এবং কুবলাই খানের বংশধরেরা চীনদেশকে অল্পকিছুদিনের জন্য হ'লেও পৃথিবীর ইতিহাসের মূলধারাটির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তবুও তাঁরাও চীনাদের গর্বিত স্বাতন্ত্র্য স্থায়ীভাবে ভাঙতে পারেননি। প্লিনির পরবর্তী কালেও এই স্বতন্ত্রভাব কেবলি বেড়েই চলেছে এবং শেষাবধি ইউরোপীয়রা চীনের বন্দরগুলিতে পৌঁছোলেও চীনদেশীয়রা তাঁদের আপন ক'রে নিতে পারেন নি। এই যুগে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক ভূগোলের অবনতি ঘটেছিল সত্য, তথাপি তাদেরও বিপুল সম্ভাবনা ছিল। ফসল না এলেও বীজরোপণ মিথ্যা হয়ে যায় না, আধুনিক জাতি গঠনের শৈশব কালে আবিষ্কার ও প্রকাশের সহজপ্রবৃত্তির প্রাধান্য আশা করা যায় না। সমগ্র ভূ-ভাগে একচ্ছত্র ইউরোপীয় আধিপত্যের ক্রমবিকাশ জানতে গেলে তার উৎপত্তি থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। এই উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায় আলোচ্যযুগের তীর্থযাত্রী-পথিক ও ধর্মপ্রচারকদের রচনা, মানচিত্র ও ধর্মীয় বিজ্ঞান থেকে।

রোম সাম্রাজ্যের ধর্মান্তরকরণ থেকে শুরু ক'রে ষোড়শ শতাব্দী অবধি খ্রীষ্টীয় আধিপত্যের ইতিহাস অটুট ও অভগ্ন। এই সময়কাল থেকে পিছনের দিকে তাকালে বিশ্লেষণের স্পষ্টতা থাকে না। মধ্যযুগের ইউরোপ নিজেকে ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় এক সুপ্রাচীন জগৎ-রাষ্ট্র বলে মনে করতে সুখী হ'তো। কনস্ট্যানটাইন ও কলম্বাস, উভয়ের আমলেই এই সভ্যতার দুটি প্রধান বিষয় ছিল ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্য এবং খ্রীষ্টীয় গির্জা। এই জন্যেই আবিষ্কার, অভিযান ও ভৌগোলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জীবনধারা বিস্তারের এক অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস আছে। কনস্ট্যানটাইনের পূর্বকালে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক জীবনের একটি বিশেষ শর্ত অপূর্ণ থেকে যায়। প্রাচীন এবং আধুনিককালের ইতিহাসের সত্যকার পার্থক্য এ-ই কিনা, এ নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ আছে। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান জগতে আবিষ্কারার্থ ভ্রমণগুলি ছেদহীনভাবে চলে আসেনি। পৌত্তোলিকদের বিলোপের কালে অতীতের

কৃতকর্মগুলি আংশিকভাবে বিস্মৃত ও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বিষয়টিকে পুরোপুরি নতুনভাবে সাজানো হ'ল, সমস্যার পুনর্নির্মাণ ক'রে অতীতের জ্ঞানগুলিই পুনরায় অর্জন করতে হ'ল। এই সাধারণ বিশৃংখলার মধ্যে অকালজাত বিজ্ঞানের কিছু সুপ্রাচীন ও ভ্রান্ত তত্ত্ব হারিয়ে গেল এবং বেশিরভাগই পরীক্ষিত সত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করল। মধ্যযুগের গোড়ার দিকের ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ টলেমির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলতেন না। তাঁদের ভূগোল এক সম্পূর্ণ নতুন পথে স'রে গিয়েছিল এবং নতুন সমস্যাবলী নিয়ে নিমগ্ন থাকতো। সুতরাং আরব অধিবিদ্যা যে অর্থে অ্যারিস্টটলের সাক্ষাৎ বংশোদ্ভব বলা যায়, এঁদের সেই অর্থে গ্রীক চিন্তাধারার রেখাভিমুখ বলা চলে না। চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বকালের খ্রীষ্টীয় ভূগোল এবং অভিযানের ওপর প্রাচীন শাস্ত্রের পরম প্রতিভাগুলির কেবলমাত্র এক অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে।

মধ্যযুগীয়, বিশেষতঃ ধর্মযুদ্ধ, পূর্ববর্তীকালের কোনও ভ্রমণবৃত্তান্তেই উচ্চতর ধ্রুপদী ভূগোলের বিশেষ চর্চা দেখা যায় না। উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত ও অব্যবহৃত সম্পত্তির মতো এই জ্ঞানও সাধারণতঃ বিস্মৃতির আড়ালেই প'ড়ে ছিল, কদাচিৎ কেউ কেউ একথা উপলব্ধিও করেছেন। পৌত্তোলিক সমাজের বিলোপ এবং খ্রীষ্টীয় আধিপত্য বিস্তারের মধ্যবর্তীকালে জীবন ও ভ্রমণ অপেক্ষা সাহিত্যেই এর অধিক প্রকাশ।

সাম্রাজ্য খ্রীষ্টধর্মে রূপান্তরকরণের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রা প্রভৃতি শুরু হ'ল। গ্রীস ও রোমের পৌত্তোলিক জগতে অনুরূপ কিছু কোনদিন দেখা যায়নি। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব প্রাচ্য ধর্মগুলি অথবা রোম সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাইরের ধর্মবিশ্বাসগুলিতেও ঠিক এই ধরণের প্রচেষ্টা হয়নি। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই খ্রীষ্টীয় তীর্থযাত্রার সমতুল্য পর্যটন দেখতে পাওয়া যায়।

ধার্মিক গ্রীকরা দৈববাণী প্রকাশের স্থানগুলির উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করতেন এরথেকে তারও পার্থক্য আছে। তাঁরা দৈবসন্দর্শনের স্মৃতিচিহ্ন উপাসনার উদ্দেশ্যে নয় বরঞ্চ প্রত্যাদেশ লাভের, বিশ্বাসের পরিপূর্ণ উপলব্ধির, অথবা পবিত্র লিখনের প্রগাঢ় অর্থ অনুভবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতেন। বলাই বাহুল্য যে ইহুদীদের জেরুজালেম যাত্রা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টানদের এই মানসিকতারই অগ্রদূত এবং চতুর্দশ শতাব্দীর পর খ্রীষ্টীয় রীতির সমান্তরাল হিসেবে গণ্য করা যায়। কোনও ধর্মীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী যাত্রাও একটি ইহুদী ধারণা বা ভাব, এই ভাবেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় পশ্চিমের ক্যাথলিকদের রোম সন্দর্শনে। অবশ্য ধর্মীয় উপাসনা ছাড়া অন্যান্য আরও ব্যবহারিক কারণও এর পশ্চাতে ছিল। কিন্তু প্যালেস্টিনীয় ও পূর্বভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তীর্থযাত্রাগুলি ছিল (উদাহরণস্বরূপ গ্যালিসিয়ান থেকে কম্পোসটেলা যাত্রার কথা বলা যায়) প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ, ফলত এরা ক্ষয়ও পেয়েছে দ্রুত। আদর্শের ওপর ব্যবহারিক প্রয়োজনের সুবিধাগুলি যতই অনুভূত হ'ল প্রাচ্য তীর্থযাত্রাগুলি ততই গুরুত্ব হারালো। ক্রমশঃ এই পর্যটনগুলি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক শ্রেণীর নিজস্ব বিষয় হয়ে উঠল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তীর্থযাত্রীদের জন্য তথ্যাদি এবং অনুরূপ রচনা কেবলমাত্র নিম্নতম জনসাধারণকে

পরিবেশনে ব্যবহৃত হতো। বহুকাল পরে এক মহান পুরুষ, কলম্বাস জীবনে তীর্থযাত্রা ও ভ্রমণের ব্যবহারিক উপযোগিতা স্বীকার করেছিলেন। তবুও প্রায় বারোশো বছর ধ'রে খাঁটি ভাবপ্রবণ কারণে তীর্থযাত্রার মানসিকতা সক্রিয় ছিল। ধর্মযুদ্ধগুলির, যাদের প্রকৃত কারণ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের জীবনধারার বহু গভীরে উপ্ত, এই তীর্থযাত্রাগুলি তাদের পশ্চাতে প্রেরণাদায়ক ও প্রত্যয় উৎপাদনকারী এক বাহ্যিক কারণ সরবরাহ করেছিল। সর্বোপরি একথাও মনে রাখতে হবে যে ছয়টি শতাব্দী ধ'রে এই ধর্মীয় যাত্রাগুলিই রোমান আধিপত্যের একমাত্র সক্রিয় প্রচেষ্টা। ক্বচিৎ হ'লেও এগুলি অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষদের কাজ; তদানীন্তন প্রাণশক্তির পরিচয় এই যাত্রাগুলি। জগতের অনাগত জাতিগুলির বাক্‌শক্তি ও অভিব্যক্তির সুদীর্ঘকালের উন্নতির পথে অসংলগ্ন হ'লেও এই সব যাত্রাসমূহের বিবরণ এক ইঙ্গিতপূর্ণ চিন্তাসঞ্চারক অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয় তীর্থযাত্রাও অনেকাংশে এক নতুন বিষয় ছিল; অন্যান্য নতুন বিষয়ের মতোই-এরও শক্তির উপাদানগুলিই ছিল এর দুর্বলতারও উৎস। কারণ সর্বোপরি এই যাত্রাগুলি ছিল ভক্তিমূলক; কিন্তু মানুষকে যে ধর্মীয় প্রেরণা দূরদূরান্তে নিয়ে যায়, সেই অনুভূতি অপরপক্ষে তার ধর্ম ও ভক্তির সুনির্দিষ্ট পথের বাইরে অন্য সবকিছু, অর্থাৎ মানুষের জীবনধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য ক'রে। সুতরাং ভূগোল শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য তথ্য যদি কিছু তারা সরবরাহ করেও থাকে, তা একান্ত আনুষঙ্গিক এবং অনভিপ্রেত। প্রথম কয়েকজন তীর্থযাত্রীর মধ্যেই আমরা এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসমূহ পেয়ে যাই। তাঁদের লেখায় সাধারণতঃ কমই নিরপেক্ষ তথ্যাদি পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ ও বস্তুগত আবিষ্কারের পরম সুযোগ তাঁরা হেলায় হারিয়েছেন; তাঁরা সম্পূর্ণ অন্যধরণের জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত ছিলেন এবং ব্রহ্মবিদ্যাগত ধ্যানের খোরাক যোগায় না এমন বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল না। এই কারণে তীর্থযাত্রা-ভ্রমণকে উন্নয়নকামী বলা চলে না; চতুর্থ বা ষষ্ঠ শতাব্দীর তুলনায় নবম শতাব্দীতে এই ধরনের ব্যাপক ও প্রণালীবদ্ধ ভ্রমণের সংখ্যা খুবই কম। এই সকল প্রচেষ্টার মূল্য সত্যই অনিশ্চিত কারণ এগুলিই সে যুগের একমাত্র ভৌগোলিক দলিল। সেহেতু, বাণিজ্য, বিজয় কি উপনিবেশ স্থাপনের প্রাচীন দুর্দম ইচ্ছা যদি একবার নতুনভাবে জেগে ওঠে এবং নতুন অনুপ্রেরণায় চতুর্দিকে অঙ্কুর বিস্তার করতে শুরু করে, তবে এক ঈশ্বর ভক্তি ছাড়া ধর্মীয় ভ্রমণের আর কিছুই থাকে না।

এই রচনাগুলির মধ্যে থেকেই সেই যুগের মানসিক অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রচনাগুলি আমাদের শেখায় যে, একজন বহুদর্শী শিক্ষিত খ্রীষ্টানের চিন্তাধারা ও বক্তব্য যখন এই রকম, সেই অবস্থায় বস্তুগত উন্নতি কি কঠিনই না ছিল। এই রচনাগুলি আমাদের আরও দেখায় যে, কোনও রকম বৈষয়িক উন্নতির জন্য ভাবপ্রবণ নয়, সম্পূর্ণ বস্তুবাদী মন প্রয়োজন। ভৌগোলিক এবং শিল্পবিপ্লবের চালিকাশক্তি ছিল কিছুটা রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্য বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রভৃতি বস্তুগত লাভের আশা এবং প্রেরণা। জ্ঞানার্জনের জন্য অনুসন্ধান এই সব ভক্তিমূলক ভ্রমণে দেখা যায় না।

ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিকর অধ্যায় মধ্যযুগের প্রথমভাগের পর আমরা এক নতুন মানুষ ও নতুন উদ্দীপনার সম্মুখবর্তী হই। জড় দেহে প্রাণ সঞ্চার করার মতো উত্তরাঞ্চলের ভাইকিংরা যেন এই নতুন উৎসাহের বারুদে অগ্নি সঞ্চার করল। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে ধর্মযুদ্ধ থেকে শুরু ক'রে ক্রমবর্ধমান খ্রীষ্টীয় আধিপত্য এই অনুপ্রেরণারই ফলাফল। ধর্মযুদ্ধের কারণেই জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অভিযানগুলি আবদ্ধ হ'ল, এই যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সম্পন্ন হ'ল এবং অজানা রহস্য জয়ের উদ্দেশ্যে নানারকম চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা উৎসারিত হ'তে থাকল। পুনর্বার নতুন সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত পাশ্চাত্য জগৎ এক প্রশস্ততর জীবনের জন্য—আয়তন বৃদ্ধির জন্য চতুর্দিকে স্থান খুঁজতে লাগল ; ভূভাগের এই অবগুণ্ঠন মোচনের সঙ্গে প্রকৃতির ওপর মানুষের জয়যাত্রার সূচনা হ'ল। প্রথম উষার মতো এই আলো ছিল ক্ষীণ, টলোমলো, অনিশ্চিত পদক্ষেপ, মিথ্যা ছলনাময় উচ্চাশা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়, আশা-নিরাশার দোলায় আন্দোলিত এই প্রথমভাগ কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এই ধরণের তীর্থযাত্রা যখন সফল হ'ল তখন থেকে এই জয়যাত্রা সম্মুখবর্তী পথ ধ'রে কেবল এগিয়েই চলেছে। মুসলমানদের যুদ্ধে পরাস্ত করতে এসে ফ্র্যাঙ্করা (The Franks) তাদের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছে ও তাদের থেকে জ্ঞানার্জন শুরু করেছে। মূল উদ্দেশ্যের চেয়ে আপতিক লাভই এখানে বড় হ'য়ে উঠেছে। কোরাণ উপাসকদের দমিত করার চেয়ে লাভজনক ছিল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, মুসলিম জগতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য গ'ড়ে তোলা। বর্তমান এক সুনিশ্চিত এবং অভ্রান্ত সত্য, তাকে অস্বীকার ক'রে যে জীবনে কোনও উন্নতিই সম্ভব নয়। ধর্মযুদ্ধগুলি অতি ধীরে বহু প্রাচীন, অসম্বদ্ধ অপ্রকাশিত এই গোপন কথা খ্রীষ্টান জগতকে মনে করিয়ে দিল যে বস্তুগত সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয়-ভাব একান্তই অপ্রতুল।

কিন্তু এই উপলব্ধি একদিনে আসেনি। এই বইতে যে যুগ নিয়ে আলোচনা, সে যুগের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ঈশ্বরতত্ত্বে তাঁদের রচনাগুলি এমনই পরিপূর্ণ যে ভাবতেও অবাক লাগে এই বিচিত্র ও অত্যুৎকৃষ্ট আধুনিক পৃথিবী গঠনে এঁদেরও অবদান আছে। বর্তমানের চেয়ে বহুলাংশে পৃথক ধরণের এক খ্রীষ্টধর্ম বাস্তবিকই আমাদের সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমান বিষয়বস্তু সমীক্ষায় এই দিকটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতেই হবে। যুগ যুগ ধ'রে ঈশ্বরতত্ত্বই যখন অনুসন্ধান ও ভূগোলচর্চার আগ্রহকে জীইয়ে রেখেছে তখন এই পর্বটিকে অবহেলা বা একে ক্ষয় ও দুর্বলতার লক্ষণ বলে গণ্য করা চলে না। অ্যারিস্টটল এবং প্লেটো, টলেমি এবং স্ট্রাবো, লুক্রেশাস এবং ট্যাসিটাস, সিসেরো এবং রোমান বিচারকদের উত্তরাধিকারী সাম্রাজ্য বা রাজনৈতিক সমাজকে গির্জা ও ঈশ্বরতত্ত্ব বহুদিন ধ'রে নিয়ন্ত্রণ ক'রে এসেছে একথা ভুলে গেলে চলবে না। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে রাইন ও দানিয়ুব নদের উত্তরদিক থেকে আগত বর্বরজাতির লোকেরা এই সাম্রাজ্যকেই পরম স্বীকার ক'রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। জীবনের সত্যকে মেনে নেবার মতো, খ্রীষ্টীয় গির্জা ও তার বিভিন্ন প্রকাশগুলিকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। সভ্য সূক্ষ্মতা

এবং অসভ্যশক্তি—উভয়কেই সে জয় করেছিল। সেকালের ইউরোপীয় জাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-গুলির ওপর খ্রীষ্টীয় গির্জার আধিপত্য অনস্বীকার্য।

তবে একথাও খেয়াল রাখতে হবে যে রোমান সাম্রাজ্যের পরবর্তী অধীশ্বরদের মধ্যে শক্তি ও দৃঢ়তার অভাব দেখা যায়। এই দুর্বলতাই খ্রীষ্টান গির্জার সর্বময়তার কারণ। তাঁদের পক্ষে টিউটন ও সারাসেন আগ্রাসনগুলি ঠেকানো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তৎপরিবর্তে খ্রীষ্ট ও ইহুদীধর্ম যেন ইসলামকে সাদরে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীর আসনে বরণ করেছে। অগাষ্টাস প্রভৃতি প্রথমদিকের সম্রাটদের দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতার সম্মুখে মহম্মদের কোনও রকম আবেদনই খাটতো না।

তবে একথা কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই সত্য, কারণ এখানে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতিক দর্শনের সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কি খ্রীষ্টধর্মে, কি ইসলামে ধর্মীয়ভাব ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠে জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধা দিচ্ছিল। যুক্তিহীন বিশ্বাস ক্রমশ বিজ্ঞানকে পশ্চাতে ঠেলে দিতে থাকলো এবং উন্নতি ও জ্ঞানার্জনের পথে ধর্মই প্রধান বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ালো।

অপরপক্ষে একেশ্বরবাদী ইসলামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেহেতু খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা তা অনেক কম জটিল, মতবাদপূর্ণ ও পরস্পরসম্বন্ধ ধর্মবিশ্বাস, যাতে পুরোহিতবৃত্তি, ধর্মানুষ্ঠান, রহস্যমূলক আচারাদি খুব সহজ ধরণের এবং খুব অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেহেতু বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সংঘর্ষ তেমন জোরদার হয়নি। কিন্তু মার্জিত খলিফার কপালেও ভবিষ্যতে সেই অন্তিম সংগ্রাম লেখা ছিল, যখন তত্ত্ববাদী ও বৈজ্ঞানিক সকলে সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে এক সার্বজনীন নিয়তির সম্মুখীন হ'য়ে অধিকতর বিপদকে ঠেকালেন। একদিকে, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বর্বর তুর্কীরা ক্ষয়রোগের মতো দ্রুতবেগে ছড়িয়ে প'ড়ে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তন-ভাবনের ফসলগুলি ধ্বংস ক'রে ফেলছিল। যুদ্ধ ছাড়া কোনও রকম বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রতি তাদের** উৎসাহ ছিল না। অপরদিকে, পশ্চিমে, স্পেনের মুসলমানরা অভ্যন্তরীণ কলহ ও নৈরাজ্য নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। খ্রীষ্টরাজত্বে ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কর্ডোবার মুসলিম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে গেল। রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি ও প্রাচীন সরকার নিমজ্জনের পর পরই সেযুগের বিজ্ঞান ধর্মের বন্ধু না শত্রু হবে—এ জাতীয় কোনও প্রশ্ন ওঠে নি। শান্তি, সুব্যবস্থা ও জ্ঞানার্জনের পক্ষে ছিলেন তত্ত্ববাদীরা; সকল রকম হিতের পক্ষে এবং গর্হিতের বিপক্ষে ছিলেন তাঁরা। প্রধানতঃ গীর্জার এই যাজকসম্প্রদায়ের কৃতিত্বেই অতীত সভ্যতার কিয়দংশ রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। পুরনো রাজনৈতিক প্রথার ক্ষয়ের পর এঁদের দ্বারাই ধর্মসঙ্ঘ পরিচালিত

** কায়রোতে অবস্থিত মামেলুক অট্টালিকা দেখে মনে হয় স্থাপত্যের প্রতি হয়তো এদের কিয়দংশে আগ্রহ ছিল। অবশ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থে ঈজিপ্টের মামেলুক সম্রাটদের 'তুর্কী' বলা চলে।

আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, এই গোষ্ঠী বহুদিন ধ'রে তার রাজনৈতিক প্রকাশের চেষ্টা ক'রে গেছে।***

আমাদের অনুসন্ধানের এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে এই গির্জা পরিচালিত গোষ্ঠীর ভ্রমণ ও ভ্রমণবৃত্তান্তই বেড়ে চার্লস দি গ্রেট বা গেরবার্ট-এর জগতে ভৌগোলিক ধারনাসমূহকে টিঁকিয়ে রেখেছিল। সংশয়বাদী খ্রীষ্টানদের নিন্দা করা সত্ত্বেও কসমাসের (Cosmas) নিজের লেখাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অস্বাভাবিক বলে গণ্য করা যায়, এমনকি 'টোপোগ্রাফি' (Topography) নামক তাঁর অসহ্য খড়ের আঁটি থেকেও বেশ কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক ছুঁচ খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যান্য, অপেক্ষাকৃত বর্বর অঞ্চলগুলিতে বা সময়কালের বিশেষ কোনও তথ্যাদি পাওয়া যায় না বলে যে দু'একটি লেখা বা ম্যাপ পাওয়া যায় সেগুলিই অপরিসীম মূল্যবান, আর কিছু না হোক, নিজ বিষয়ে তাদের একচেটিয়া অধিকারের দরুণ। সেই যুগে ও তদানীন্তন মানবসমাজে তারাই একমাত্র ভূগোল শিক্ষক। এবং যেহেতু এই সমাজের মানুষরাই পরবর্তীকালে গোটা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে সেহেতু কদাকার হ'লেও এই শিক্ষা পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। অন্ধকার যুগের অবাস্তব মানচিত্রগুলিই সঠিক আধুনিক ম্যাপের পূর্বসূরী; হামাগুড়ির মতো তীর্থযাত্রীদের প্রচেষ্টাগুলিই অন্তিমের অজেয় জাতি—বিস্তারের পথে প্রথম আন্দোলন।

খ্রীষ্টীয় ভ্রমণের গোড়ার দিকের এই সকল স্মারকস্তম্ভের সঙ্গে সাধারণ, কিংবা ভৌগোলিক প্রগতির সম্যক সম্বন্ধ অনুধাবন করার চেষ্টা হয় নি। ঈশ্বরতাত্ত্বিক বা দার্শনিকেরা হয়তো এর প্রতি কিছুটা মনোযোগ দিয়েছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকরা এগুলিকে উপেক্ষাভরে ঠেলে দিয়েছেন গ্রন্থাগারের সেসব তাকে, যেখানে থাকে ঈশ্বরসংক্রান্ত বইপত্রগুলি, ফলে সাধারণ জীবন থেকে তারা নিদারুণভাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু খ্রীষ্ট পুরোহিত ও যাজকদের লেখাগুলি যেমন তাঁদের সময়কার সাধারণ জীবনযাত্রা, জাতির উন্নতি বা অবনতি প্রভৃতি বিষয় বোঝার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই খ্রীষ্টীয় ভ্রমণ-তথ্যগুলির আসল মূল্য হ'ল মানবসভ্যতার ইতিহাসে, তখন এবং পরবর্তীকালেও।

এটা অনেকবার দেখানো হয়েছে যে মানুষের প্রগতি যুদ্ধের পথে সেনাবাহিনীর সুশৃঙ্খল সামনে চলার মতো একটানা নয়, বরং তার পথ ভিড়ের ধাঁধাঁ লাগানো চলা, অনেকবার দাঁড়িয়ে, এলোমেলো-ভাবে চলা। প্রথমদিকের খ্রীষ্টীয় ভূগোল এর এক আদর্শ উদাহরণ। আপাতভাবে মনে হয় অনেক শতাব্দী ধ'রে এই নতুন ধর্মীয় কৌতূহল যেন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কোনও ছাপই ফেলে নি; বরং উল্টোটাই ঘটেছে। তবু, খ্রীষ্ট সভ্যতার যুগেই ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক ভূগোলের প্রতি এক আগ্রহ জেগে উঠেছিল। সুতরাং এ সময়ের সাহিত্যগুলির পেছনে যে উদ্দীপনাময় তথ্য রয়েছে, আমাদের সেগুলিই খুঁজতে হবে। আদি খ্রীষ্টীয় যুগ ছিল এক অর্থে বপনের যুগ, শস্য সংগ্রহের নয়। ইউরোপীয়

*** চার্লস দি গ্রেট, অটো, ধর্মযুদ্ধসমূহ অথবা খ্রীষ্টীয় রাজ্যগুলির ওপর গির্জার সার্বভৌম অভিভাবকত্বের উদাহরণ দেওয়া যায়।

জীবন ও পৌরুষ পুনর্জাগ্রত হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় মন তখনও প্রায় অকর্ষিত পড়েছিল কিছু সময়ের জন্যে।

এযুগে ভৌগোলিক অতিকথনগুলির বৃদ্ধি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে সাহায্য ক'রে যে ধর্মীয় ভ্রমণগুলির মাধ্যমে ফলাফলের অভাব ঘটছিল। এসব শতকগুলিতে ফুলে ফেঁপে উঠছিল বা জনপ্রিয় হচ্ছিল পর্যটকদের কাহিনীগুলি যা শুনে চমৎকৃত হওয়া যায় কিন্তু যেগুলি মানবপ্রচেষ্টা গ'ড়ে ওঠার পথে সত্যি প্রচণ্ড বাধা। এসব কাহিনীতে প্রতিফলিত হয় প্রকৃতি সম্পর্কে ভীতি ও অজ্ঞতা, যা ছিল আদি-মধ্যযুগের বিচ্ছিন্নতা, দারিদ্র্য ও বর্বরতার মূল কারণ। কপোলকল্পনা ও ছদ্মবিজ্ঞান মানুষের বদলে পৃথিবীকে দানবে পূর্ণ করল, সমুদ্রগুলির ওপরে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের পর্দা টেনে দিল, এবং ভূগোলের প্রতিটি জ্ঞাত তথ্যের অনুকরণে টেনে আনলো হাস্যকর একটি কাল্পনিক কাহিনী যা স্থানচ্যুত করতে চাইল তার উৎসকেই।

আবার, খ্রীষ্ট সাম্রাজ্যের এই বহুদিন ধ'রে পিছিয়ে থাকার কারণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষিত হয় এক সাধারণ খ্রীষ্ট বিরোধী, ইউরোপ বিরোধী আন্দোলনের কতকগুলি প্রভাবের দিকে। প্রথমত, স্পেনীয় খালিফা বিস্কে উপসাগরের পশ্চিমের সমুদ্রে যাবার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ; অনুরূপভাবে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নতুন শাসকদের আগমনের ফলে খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যের প্রাচ্য ও দক্ষিণের সঙ্গে যোগাযোগ—আবিসিনিয়া, ভারত বা চীনের সঙ্গে—মারাত্মকভাবে ব্যাহত হ'ল। এভাবে খ্রীষ্টীয় ইউরোপের ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়লো বাস্তবে সংকুচিত। যেমন মুসলিম বণিক ও জলদস্যুরা দখল ক'রে নিল পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, তেমনই মুসলিম চিন্তাধারার বিকাশ আত্মসাৎ করল কয়েকজন দক্ষতম পাশ্চাত্য দার্শনিককে। জীবনের প্রতিটি কলায়, প্রতিটি উপভোগে, প্রতিটি বিজ্ঞানে নবম ও দশম শতাব্দী পর্যন্ত মহম্মদ অনুগামীদের জয় সম্পূর্ণ ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল।

এ বিষয়ে হাতে যা নথিপত্র আছে তা তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে : প্রথমতঃ পর্যটকদের রচনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা তীর্থযাত্রী পর্যটক ; দ্বিতীয়তঃ মিশনারী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি ; তৃতীয়তঃ ভূগোলের তাত্ত্বিকদের রচনা, নানান জায়গায় না ঘুরে লেখা অনেকক্ষেত্রে দার্শনিকদের রচনা ; এর সঙ্গে গণ্য করতে হবে ড্রাফটসম্যানদের মানচিত্রগুলিকে যাঁরা ধর্মীয় গ্রন্থগুলির অলঙ্করণের চেষ্টা করেছিলেন পৃথিবীর কোনও একটা ছবি এঁকে। খ্রীষ্টীয় প্রথম নয়টি শতাব্দীতে লেখা পর্যটকদের রচনাগুলি আমাদের কাজে লাগছে ; আরও সঠিক ক'রে বলতে গেলে চতুর্থ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত যেসব অভিযান হয়েছে সেগুলিতে এঁদের অবদান রয়েছে কিছু। তীর্থযাত্রীদের বর্ণনাগুলি পড়ে কয়েকটি গোষ্ঠীতে, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। প্রথমদিকের পর্যটকদের সম্রাট কন্সটানটাইন ও প্যালেসটাইনে তাঁর মাতা হেলেনকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে ; দ্বিতীয় যুগের লেখাগুলি বেথলেহেম বা রোমের জেরোমকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে ; তৃতীয় গোষ্ঠী কেন্দ্র করেছে

ক্যাথলিক সম্রাট জাস্টিনিয়ানকে যাঁর নির্মিত অট্টালিকাগুলি পবিত্র শহর জেরুজালেমের ভূমিরূপে নতুন যুগের সূচনা করেছিল ; সর্বশেষে চতুর্থযুগের তীর্থযাত্রীরা যদিও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, প্রায় সকলেই ফরাসী ও ইংরেজদের ধর্মান্তরকরণের সঙ্গে যুক্ত।

আবার তীর্থযাত্রী-ভ্রমণের ইতিহাসে দেখা যায় দুই প্রধান ধরণের তথ্য—কতকগুলি পর্যটকদের নিজেদের লেখা, আর অন্যগুলি অন্যদের লেখা পর্যটকদের ভ্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রথম ধরণের রচনাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যেমন তুরের গ্রেগরি (Gregory of Tours)-এর রচনায় পাশ্চাত্য থেকে ভারতে আসা পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে অল্পই তথ্য পাওয়া যায়।

ধরা যাক কসমাস 'দি ম্যান হু সেইলড টু ইণ্ডিয়া'। এঁর রচনাগুলি বিশেষ সমস্যার উপস্থাপন করে। ইনি বেশি খ্যাত তাত্ত্বিক হিসেবে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী যে গোল তা প্রমাণ করা। কিন্তু ইনি ছিলেন এক ব্যবহারিক পর্যটক, অদ্ভুত এক উচ্চাকাঙ্খী ধরণের। লোহিত সাগরের প্রান্ত থেকে তিনি যাত্রা করেন মালাবার ও শ্রীলঙ্কায়, ইজিপ্টে ফিরে আসেন সম্ভবত প্যালেসটাইন হয়ে, এবং নিজের পুরনো পেশা ব্যবসা ছেড়ে তাঁর আশ্রমে স্থিতিলাভ করেন ও তাঁর 'টোপোগ্রাফি' নামে বইটি রচনা করেন। অযৌক্তিক, অসম্ভব এক দার্শনিক হ'লেও তিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে আদৌ অবজ্ঞেয় নন ; এবং তাঁর রচিত বইটি একটি নিজস্ব স্থানও অর্জন করেছে একদিকে প্রকুপিয়াসের (Procupius) রচনার বিচারশক্তি ও অন্যদিকে গ্রেগরি অফ টরস-এর সহজ বিশ্বস্ততা ধার ক'রে।

লাটিন পর্যটকেরাও পাশ্চাত্যের ওপরে বাইজ্যানটাইন জগতের প্রভাব সম্পর্কে তেমন কোনও প্রমাণ দেন না। যদিও আরকালফ (Arculf) ও উইলিবল্ড (Willibold) তাঁদের সময়কার কনস্টানটিনোপল সম্পর্কে অনেক বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শহর ও সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের 'মহানগরী' আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু দু'জনেই তার সারমর্ম ধরতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। লাটিন ভূগোলের রচনায় গ্রীক খ্রীষ্টীয় জগৎ সম্পর্কে কোনও গভীর ধারণার বিশেষ অভাব রয়েছে। পাশ্চাত্য যেন ধীরে ধীরে গ্রীক জগতের ভাষাই ভুলে যাচ্ছিল। ধর্মীয় নীতির পার্থক্য প্রকট হবার আগেই ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল। ফলে বাইজ্যানটাইন বণিকেরা ভারতে, চীনের দেওয়াল পর্যন্ত বা অবিসিনিয়ার ভেতরে পর্যটন করেছিলেন কিনা এই তর্কের কোনও তাৎপর্য থাকে না যদি না তাঁদের কাজের ফলাফল উত্তরসূরীদের কাছে পৌঁছিয়ে অপেক্ষাকৃত উদ্দীপনাময় এক জাতি সৃষ্টির কাজে লাগে। কসমাসকে বাদ দিলে তাঁদের প্রত্যেকেই এধরণের স্থায়ী কিছু করেন নি, বরং ক্রমশই পিছু হটেছেন। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এধরণের নিষ্ফলা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক 'প্রসারের' দাম যেন বেশি না দেওয়া হয়।

পরিশিষ্ট ঃ বীজলের লেখা আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের। স্বভাবতই তাঁর ইংরেজি অত্যন্ত জটিল ধরণের। সুদীর্ঘ বাক্য, মধ্যযুগীয় ভূগোল, দর্শন ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সূত্র তাঁর

লেখার প্রতি ছত্রে। আমরা, প্রায় একশো বছর পরে যারা ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া করেছি তারা এধরণের বিশেষণপূর্ণ বাকবন্ধ রচনায় অভ্যস্ত নই। বীজলের লেখার একটানা প্রবাহ ও মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় যেন।

লেখার অনুবাদ করার সময়ে আমি চেষ্টা করেছি বীজলের আদি লেখার প্রতি যতদূর সম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে। ফলে জায়গায় জায়গায় আড়ষ্ট বা অতিদীর্ঘ মনে হলেও মূল রচনার প্রতি আনুগত্য বজায় থেকেছে। সর্বোপরি, বীজলের লেখার সৌরভ অনুবাদের মাধ্যমে, কিংবা বলা উচিত অনুবাদ সত্ত্বেও, পাঠকেয় ইন্দ্রিয়গোচরে আনার চেষ্টা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সবশেষে বীজলের বই-এর নামকরণ, যা এই প্রবন্ধেরও শিরোনাম, তা নিয়ে একটু আলোচনা করতেই হয়। রাত সুদীর্ঘ বলে মনে হলেও প্রতিটি রাতের শেষেই আসে প্রভাত, যখন দিবাকর অন্ধকার দূর ক'রে সুস্পষ্ট ক'রে তোলেন সর্বকিছু। মানবসভ্যতার ইতিহাসেও মধ্যযুগ হ'ল তথাকথিত অন্ধকারের যুগ, যখন মানুষের চিন্তা-ভাবনা যেন সবই ধর্মের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিল।

বীজলের মতে আধুনিক যে ভূগোল (যাকে তাঁর উত্তরসূরীরা 'ক্লাসিক্যাল'—সনাতনী ভূগোল বলে আখ্যা দেন) তার বীজ কিন্তু নিহিত আছে মধ্যযুগ শেষের আবছা অন্ধকারে। খ্রীষ্ট ইসলাম দ্বন্দ্ব, ইউরোপের পূর্ব-পশ্চিমের মতাদর্শগত ভেদ—এসবেরই মধ্যে থেকে উঠে এসেছে আধুনিক ভূগোল। আর সেই প্রভাতকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও তার ভৌগোলিক ব্যাখ্যাকে কিভাবে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত করেছে সেসময়ে, বীজলে তারই এক প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিক ভূগোল মানে আমরা মনে করি ব্যাখ্যাহীন বিবরণের শেষ ; খোলামনে পৃথিবীকে জানা, প্রাপ্ত তথ্যের সুসংহত শ্রেণীবিভাগ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে সেই তথ্যের ব্যাখা দেওয়া।

মনে রাখতে হবে যে বীজলে তাঁর বইটি লিখেছেন প্রায় একশো বছর আগে। আজকের অধিকাংশ ভৌগোলিকই ভূগোলের চিন্তাধারার বিবর্তনে মধ্যযুগের প্রথম চেষ্টাগুলির অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। কিন্তু বীজলে যে সময়ে বইখানি লিখেছিলেন, তখনও এধরণের যুক্তি পণ্ডিতমহলে এত জনপ্রিয়তা পায় নি। তখনও মধ্যযুগকে ভৌগোলিকেরা অন্ধকারের কাল ব'লে তাচ্ছিল্য করছেন। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে বীজলে প্রথম সাহস দেখিয়েছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভূগোল চিন্তার বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার।

'আধুনিক ভূগোলের প্রভাত' বইখানির তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।